সূরা আল-কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ
وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ
نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ
فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَحْذَرُوْنَ ۝٦ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ
عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ
وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا
وَّحَزَنًا ۭ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝٨ وَقَالَتِ
امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ڰ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ
اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ
اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰي قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ
عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝١٢ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى
اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) তা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। (৪) ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতপর ফিরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফিরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মূসা-জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা-জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসিগণের মধ্যে। (১১) তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২) পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'আমি

তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা-সীন-মীম—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ যেসব বিষয়বস্তু আপনার প্রতি ওহী করা হয়) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তন্মধ্যে এ স্থলে) আমি মূসা (আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনার কাছে সত্য সহকারে পাঠ করে (অর্থাৎ নাযিল করে) শুনাচ্ছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের (উপকারের) জন্য। (কেননা বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নবুয়তের প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি। এগুলো বিশেষত ঈমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে—কার্যত ঈমানদার হোক কিংবা ঈমান আনতে ইচ্ছুক হোক। সংক্ষেপে বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে) খুবই উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। (এভাবে সে কিবতী অর্থাৎ মিসরীয়দেরকে সম্মানিত করে রেখেছিল এবং কিবতী অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে রেখেছিল।) সে তাদের (দেশের বাসিন্দাদের) এক দলকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) দুর্বল করে রেখেছিল (এভাবে যে,) তাদের পুত্র-সন্তানকে (যারা নতুন জন্মগ্রহণ করত, জল্লাদের হাতে) হত্যা করত এবং তাদের নারীদেরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত (যাতে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তাদের তরফ থেকে বিপদাশংকাও ছিল না,) নিশ্চিতই সে ছিল বড় দুষ্কৃতকারী। (মোটকথা, ফিরাউন তো ছিল এই ধারণার বশবর্তী।) আর আমার ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয়) অনুগ্রহ করার। (এ অনুগ্রহ এই যে,) তাদের (ধর্মীয়) নেতা করা এবং (দুনিয়াতে) তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করা এবং (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করা এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে সেইসব (অবাঞ্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের (বনী ইসরাঈলের) তরফ থেকে আশংকা করত [অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস। এই আশংকায়ই বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি স্বপ্ন ও জ্যোতিষীদের দেওয়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা হত্যা করে যাচ্ছিল।—(দুররে মনসূর) সুতরাং আমার ফয়সালা ও তকদীরের সামনে তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হল। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এর বিশদ বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন এমনি সংকটময় যমানায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন] আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, (যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়,) তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতপর যখন তুমি তার সম্পর্কে (গুপ্তচরদের অবগত হওয়ার) আশংকা কর. তখন (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তাকে (সিন্দুকে ভর্তি করে) দরিয়াতে (নীল নদে) নিক্ষেপ কর এবং (নিমজ্জিত হওয়ার) ভয় করো

না, (বিচ্ছেদের কারণে) দুঃখও করো না। (কেননা) আমি অবশ্যই তাকে পুনরায় তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (মোটকথা, তিনি এমনিভাবে স্তন্যদান করতে লাগলেন। এরপর যখন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা হল, তখন সিন্দুকে ভরে আল্লাহ্‌র নামে নীলনদে নিক্ষেপ করে দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিংবা ফিরাউনের স্বজনরা নদীভ্রমণে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে ভিড়ল।) তখন ফিরাউনের লোকেরা মূসা (আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রুতা ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী (এ ব্যাপারে) ভুলকারী ছিল। (কারণ, তারা তাদের শত্রুকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন তাকে সিন্দুক থেকে বের করে ফিরাউনের সামনে পেশ করা হল, তখন) ফিরাউনের স্ত্রী (হযরত আসিয়া ফিরাউনকে) বলল, এ (এই ছেলে) আমার ও তোমার নয়নমণি (অর্থাৎ তাকে দেখে মন প্রফুল্ল হবে। অতএব) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের (পরিণামের) কোন খবরই ছিল না (যে, এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাম্রাজ্যের পতন হবে। এদিকে এ ঘটনা হল যে,) মূসা-জননীর অন্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) অস্থির হয়ে পড়ল। (অস্থিরতা যেনতেন নয়; বরং এমন নিদারুণ অস্থিরতা যে, যদি আমি তাকে (আমার ওয়াদার প্রতি) বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা (আ)-র অবস্থা (সবার সামনে) প্রকাশ করেই দিতেন। (মোট কথা, তিনি কোনরূপে অন্তরকে সামলিয়ে নিলেন এবং কৌশল শুরু করলেন। তা এই যে,) তিনি মূসা (আ)-র ভগিনী (অর্থাৎ আপন কন্যা)-কে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। (সে চলল এবং রাজপ্রাসাদে সিন্দুক খোলা হয়েছে জেনে সেখানে পৌঁছল! হয় পূর্বেও যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কৌশলে সেখানে পৌঁছল এবং) মূসা (আ)-কে দূর থেকে দেখল, অথচ তারা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এবং তাঁর খোঁজে এসেছে।) আমি পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) মূসা (আ) থেকে ধাত্রীদেরকে বিরত রেখেছিলাম। (অর্থাৎ সে কারও দুধ গ্রহণ করত না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে) বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বান্তঃকরণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? [শিশুকে দুধ পান করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। মূসা-ভগিনী তার জননীর ঠিকানা বলে দিল। সেমতে তাকে আনা হল এবং মূসা (আ)-কে তার কোলে তুলে দেওয়া হল। কোলে যাওয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন। অতপর তাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে নিশ্চিন্তে বাড়ি নিয়ে এল। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনত।] আমি মূসা (আ)-কে (এভাবে) তাঁর জননীর কাছে (ওয়াদা অনুযায়ী) ফিরিয়ে দিলাম, যাতে (নিজ সন্তানকে দেখে) তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি (বিচ্ছেদের) দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে) জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না (এটা কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুহ্ফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হাঁা, মনে পড়ে বৈ কি! অতপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। আয়াতটি এই ঃ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আ)-র কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আ)-র কাহিনী ফিরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারুনের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ)-র কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহ্ফে তাঁর কাহিনী খিযির (আ)-র সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মূসা (আ)-র জন্য বলা হয়েছে وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونًا —ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরী মাস'আলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা তোয়াহায় এবং কিছু সূরা কাহ্ফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে। وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ—এই আয়াতে বিধিলিপির মুকাবিলায় ফিরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনস্তুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন

কাফির হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশংকা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ থেকে وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ — শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ---নবুয়তের ওহী বোঝানো হয়নি। সূরা তোয়াহায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ
فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ
قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ
فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ
أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۚ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ

أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ
رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(১৪) যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রুদলের। অতপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (১৯) অতপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। (২১) অতপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মূসা যখন (লালিত পালিত হয়ে) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন এবং (অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানবুদ্ধিতে) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম (অর্থাৎ নবুয়তের পূর্বেই ভালমন্দ বিচারের উপযুক্ত সুস্থ ও সরল জ্ঞানবুদ্ধি দান করলাম)। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ সৎকর্মের মাধ্যমে জ্ঞানগত উন্নতি সাধিত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আ) কখনও

ফিরাউনের ধর্মমত গ্রহণ করেন নি; বরং তার প্রতি বিতৃষ্ণই ছিলেন। এ সময়কারই এক ঘটনা এই যে, একবার) মূসা (আ) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে (রূহুল মা'আনী) বাইরে থেকে) এমন সময়ে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা বেখবর (নিদ্রামগ্ন) ছিল। (অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময় জানা যায় ---(দুররে-মনসূর) তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। একজন ছিল তাঁর নিজ দলের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) এবং অপরজন তাঁর শত্রু দলের। (অর্থাৎ ফিরাউনের স্বজন ও কর্মচারী। উভয়ে কোন ব্যাপারে ধস্তাধস্তি করছিল এবং বাড়াবাড়ি ছিল ফিরাউনীর।) অতপর যে তাঁর নিজে দলের, সে (মূসা (আ)-কে দেখে) তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (মূসা (আ) প্রথমে তাকে বোঝালেন। যখন সে এতে বিরত হল না) তখন মূসা (আ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে জুলুম প্রতিরোধ করার জন্য) ঘুষি মারলেন এবং তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে মারাই গেল)। মূসা (আ) এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় শয়তান (মানুষের) প্রকাশ্য দুশমন, বিভ্রান্তকারী। তিনি (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে) আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করুন। অতপর আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (এই ক্ষমার কথা নবুয়ত দান করার সময় মূসা (আ) নিশ্চিত-রূপে জানতে পারেন; যেমন সূরা আন্-নামলে আছে إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ—উপস্থিত ক্ষেত্রে ইলহাম দ্বারা জানা হোক বা মোটেই জানা না হোক;) মূসা [(আ) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যতের জন্য এ কথাও] বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন, (যা সূরা তোয়াহায় ব্যক্ত হয়েছে وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ থেকে وَلَا تَحْزَنْ পর্যন্ত) এরপর আমি কখনও অপরাধীদেরকে সাহায্য করব না। (এখানে 'অপরাধী' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা অপরের দ্বারা গোনাহের কাজ করাতে চায়। কেননা, গোনাহের কাজ করানোও অপরাধ। এতে শয়তানও দাখিল হয়ে গেছে। কারণ, সে গোনাহ্ করায় এবং গোনাহ্‌কারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে: وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا উদ্দেশ্য এই যে, আমি শয়তানের আদেশ কখনও মান্য করব না। ভুল-ভ্রান্তির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল উদ্দেশ্য এতটুকুই। কিন্তু অপর-দেরকেও শামিল করার জন্য مُجْرِمِينَ বহুবচন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা, ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাঈলী ব্যতীত কেউ হত্যাকারীর

রহস্য জানত না। ঘটনাটি যেহেতু ইসরাঈলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই সে প্রকাশ করে নি। কিন্তু মূসা (আ) এর পরও শংকিত ছিলেন। এভাবে রাত অতিবাহিত হল।) অতপর শহরে মূসা (আ)-র প্রভাত হল ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে (কারণ সে অন্য একজনের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল)। মূসা (আ) এই দৃশ্য দেখে এবং গতকালকের ঘটনা স্মরণ করে অসন্তুষ্ট হলেন এবং) বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (কারণ, রোজই কারও না কারও সাথে কলহে লিপ্ত হও। মূসা (আ) ইঙ্গিতে জেনে থাকবেন যে, রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনীর বাড়াবাড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতপর মূসা (আ) উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, [অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, সে ইসরাঈলী ও মূসা (আ) উভয়ের শত্রু ছিল। মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের। আর ফিরাউনীরা সবাই বনী ইসরাঈলের শত্রু ছিল। যদিও মূসা (আ)-কে নির্দিষ্টভাবে ইসরাঈলী বলে তার জানা না থাকুক। অথবা মূসা (আ) যেহেতু ফিরাউনের ধর্মমতের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, তাই বিষয়টি প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, মূসা (আ) যখন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আগে ইসরাঈলীর প্রতি রাগান্বিত হলেন, তখন ইসরাঈলী মনে করল যে, মূসা সম্ভবত আজ আমাকে মারধর করবেন। তাই পেরেশান হয়ে] ইসরাঈলী বলল, হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে সেরকম (আজ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? (মনে হয়) তুমি পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাও এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। [এই কথা ফিরাউনী শুনল। হত্যাকারীর সন্ধান চলছিল। এতটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউনের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দিল। ফিরাউন তার নিজের লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগান্বিত ছিল, এ সংবাদ শুনে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল। সম্ভবত এতে তার স্বপ্নের আশংকা আরও জোরদার হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেষ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এই সভায়] এক ব্যক্তি [মূসা (আ)-র বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। সে] শহরের (সেই) প্রান্ত থেকে [যেখানে পরামর্শ হচ্ছিল, মূসা (আ)-র কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব আপনি (এখান থেকে) বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর (একথা শুনে) মূসা (আ) সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় (একদিকে) বের হয়ে পড়লেন। (পথ জানা ছিল না, তাই দোয়ার ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন (এবং শান্তির জায়গায় পৌঁছিয়ে দিন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ—এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের

চরম সীমায় পেঁৗছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই أشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে أشد -এর যমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পেঁৗছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اِسْتَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, أشد তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا—حكم বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং علم বলে বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا —অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مدينة বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হত। مِنْ شِيْعَتِهٖ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মূসা (আ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন।

عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দ্বিপ্রহর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত।—(কুরতুবী)

وَكَزَ—فَوَكَزَهُ مُوسَى শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضَى عَلَيْهِ—বাক পদ্ধতিতে قَضَى عَلَيْهِ ও قَضَا তখন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা।—(মাযহারী)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ—এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, মূসা (আ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গোনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফির শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মূসা (আ)-র সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আ) একে 'শয়তানের কাজ' ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনি-ভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্যপালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شروط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফিরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে পেশ করে দেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه فى شيء ---আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ ঃ اما المال فمال غدر لا حاجة لنا فيه অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান ; কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হজর বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরয, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফিরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েয নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তুলানী বলেন ঃ

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل اخذها عند الامن فاذا كان الانسان مصاحبا لهم فقد امن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء واخذ المال مع ذلك غدر حرام الا ان ينبذ اليهم عهدهم على سواء -

অর্থাৎ---নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল ; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু হযরত মূসা (আ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি। বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মূসা (আ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-র সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় 'আহকামুল কোরআন' ---সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা, ১৩৬২ হিজরীর ২রা রজব তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি------------------ রাজিউন।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে মূসা (আ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।---(রূহুল-মা'আনী)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ —হযরত মূসা (আ)-র এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আ) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে مجرمين (অপরাধী) এর তফসীরে كافرين (কাফির) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা (আ) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আ)-র এই উক্তি থেকে দুইটি মাস'আলা প্রমাণিত হয় ঃ

১. মজলুম কাফির ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলিমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষিগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।---(রূহুল-মা'আনী) কাফির অথবা জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কোরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জ্ঞানান্বেষী বিদ্বজন তা দেখে নিতে পারেন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ

مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ

يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى

الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ
إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

(২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করার কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (২৫) অতপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (২৭) পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ

দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মূসা [(আ) এই দোয়া করে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে একদিকে রওয়ানা হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে] মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ জানা ছিল না, তাই মনোবল ও মনস্তুষ্টির জন্য নিজে নিজেই বললেন, আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন (সেমতে তাই হল এবং তিনি মাদইয়ান পৌঁছে গেলেন)। এবং যখন মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) লোকজনের একটি দলকে দেখলেন, তারা (কূপ থেকে তুলে তুলে জন্তুদেরকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা (তাদের ভেড়া-গুলোকে) আগলিয়ে রাখছে। মূসা [(আ) তাদেরকে] জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল (আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্তুদেরকে ততক্ষণ পানি পান করাই না, যতক্ষণ না এই রাখালরা পানি পান করিয়ে (জন্তুদেরকে) সরিয়ে নিয়ে যায়। (একে তো লজ্জার কারণে, দ্বিতীয়ত পুরুষদেরকে হটিয়ে দেওয়া আমাদের মতো অবলাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়) এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও না; কিন্তু) আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (কাজের আর কোন লোকও নেই। কাজটিও জরুরী। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আসতে হয়।) অতপর (এ কথা শুনে) মূসা [(আ)-র মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি] তাদের জন্যে (পানি তুলে তাদের জন্তুদেরকে) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও পানি তোলার কষ্ট থেকে বাঁচালেন)। অতপর (আল্লাহ্র দরবারে) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই (কম হোক কিংবা বেশি) নাযিল করবেন, আমি তার (তীব্র) মুখাপেক্ষী। (কেননা এই সফরে তিনি পানাহারের কিছুই পাননি। আল্লাহ্ তা'আলা এর এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীদ্বয় গৃহে পৌঁছলে পিতা তাদেরকে অস্বাভাবিক শীঘ্র চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। অতপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) মূসা (আ)-র কাছে রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্তুদেরকে) পানি পান করিয়েছেন, তার পুরস্কার প্রদান করেন। [কন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে। কারণ, তার পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মূসা (আ) সঙ্গে চললেন। তবে কাজের বিনিময় গ্রহণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই বেগতিক অবস্থায় তিনি শান্তির

জায়গা ও একজন সহৃদয় সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতাও যাওয়ার অন্যতম কারণ হলে দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আতিথেয়তার অনুরোধও নিদারুণ প্রয়োজনের সময় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে অপমানের কথা নয়। অপরের অনুরোধে আতিথেয়তা গ্রহণ করাতে তো কোন কথাই নাই। পথিমধ্যে মূসা (আ) রমণীকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে আগমন কর। আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। বেগানা নারীকে বিনা কারণে বিনা ইচ্ছায়ও দেখা পছন্দ করি না। মোটকথা, এভাবে তিনি বৃদ্ধের কাছে পৌঁছলেন।] অতপর মূসা (আ) যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (সান্ত্বনা দিলেন এবং) বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। [কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের শাসন চলত না। (রূহুল-মা'আনী)] বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজান, (আপনার তো একজন লোক দরকার। আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও) বিশ্বস্ত। (তাঁর মধ্যে উভয় গুণ বিদ্যমান আছে। পানি তোলা দেখে শক্তির পরিচয় এবং পথিমধ্যে নারীকে পশ্চাতে আগমনের কথা বলা থেকে বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে একথা তার পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল।) পিতা [মূসা (আ)-কে] বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। (এই বিবাহই চাকরির প্রতিদান। অর্থাৎ আট বছরের চাকরি এই বিবাহের মোহরানা।) অতপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা (অর্থাৎ অনুগ্রহ। আমার পক্ষ থেকে জবরদস্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে) তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। (অর্থাৎ কাজ নেওয়া সময়ের অনুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ আচরণ করব।) আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। [মূসা (আ) সম্মত হলেন এবং] বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে একথা (পাকাপাকি) হয়ে গেল। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষী (তাঁকে হাযির-নাযির জেনে চুক্তি পূর্ণ করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ—শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফিরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। মূসা (আ) ফিরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল

যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আ)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّىٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ---অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই দোয়া কবুল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মূসা (আ)-র খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এটা ছিল মূসা (আ)-র সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ماء مدين বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ ---অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

خطب — শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল ঃ (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। মূসা (আ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে

পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে।

فَسَقٰى لَهُمَا---অর্থাৎ মূসা (আ) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।---(কুরতুবী)

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ--- মূসা (আ) সাত দিন থেকে কোন কিছু আহার করেন নি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْر শব্দটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে: যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ---আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য।---(কুরতুবী)

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ---কোরআনী রীতি অনুযায়ী

এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ ঃ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা-দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আ)। যেমন এক আয়াতে আছে ঃ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا --- (কুরতুবী)

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ---বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ---অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার এক-জন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন জরুরী শর্ত দুইটি ঃ হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারী পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কোরআনী পথ-নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ---অর্থাৎ বালিকা-দ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব (আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ)-র কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণত হযরত উমর (রা) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উসমান গনি (রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।---(কুরতুবী)

হযরত শোয়ায়ব (আ) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবূল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। মূসা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। কোরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বোঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হল? ---(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কোরআন)

عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ---এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা. এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কোরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরীয়তে জায়েয না হলেও শোয়ায়ব (আ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কোর-আন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রঃ) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি---এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের

বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরী। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েয। --(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় أَنْ تَأْجُرَنِي শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি মূসা (আ) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার যিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাস'আলা ঃ أُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ
نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ
اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى
اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا
جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ڰ اِنَّكَ
مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ
سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

(২৯) অতঃপর মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হল, হে মূসা! আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারূন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [শোয়ায়ব (আ)-এর অনুমতিক্রমে] সপরিবারে (মিসরে অথবা শামদেশে) যাত্রা করলেন, তখন (শীতের রাত্রে

অজানা পথে) তিনি তূর পর্বতের দিক থেকে (একটা আলো তথা) আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি (আমি সেখানে যাই)সম্ভবত আমি সেখান থেকে (পথের) কোন খবর নিয়ে আসব অথবা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে [যা মূসা আ-এর ডান দিক ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে আওয়াজ দেওয়া হল, হে মূসা, আমিই আল্লাহ্---বিশ্ব পালনকর্তা। আর (ও বলা হল) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।) অতঃপর তিনি যখন লাঠিকে সর্পের ন্যায় হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরিয়ে পালাতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (আদেশ হল,) হে মূসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মু'জিযা। আরেকটি মু'জিযা লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর) তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে (লাঠির রূপান্তরের ন্যায় এই মু'জিযা দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) ভয় (দূরীকরণ) হেতু তোমার (সেই) হাত (পুনরায়) তোমার (বগলের) উপর চেপে ধর (যাতে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয়।) এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি (যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করা হচ্ছে) তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। মূসা (আ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলাম। কাজেই আমার ভয় হয় যে, তারা (পূর্বেই) আমাকে হত্যা করবে (ফলে, প্রচার কার্যও হতে পারবে না)। এবং (দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার মুখও তত চালু নয়।) আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। আপনি তাকেও আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালত দান করুন। সে আমার (বক্তব্যের) সমর্থন (বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে। (কেননা) আমি আশংকা করি যে, তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (তখন বিতর্কের প্রয়োজন হবে। মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত।) আল্লাহ্ বললেন, (ভাল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহুবল করে দিচ্ছি (এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হল) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হল) আমি তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। (সুতরাং আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা (তাদের উপর) প্রবল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ---অর্থাৎ মূসা (আ) যখন চাকরির নির্দিষ্ট আট

বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা (আ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্ বুখারীতে আছে হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ (الى) اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

---এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ, সূরা নমলে اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ এবং আলোচ্য সূরায় اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরার উল্লিখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল---রূপক তাজাল্লী। কারণ, সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং মূসা (আ)-কে لَنْ تَرَانِىْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না---মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায়ঃ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ---তূর পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্যঃ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا---এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى

وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٦ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ
بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ
لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٣٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا
لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣٨
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ
اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝٣٩ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠ وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝٤١ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۝٤٢

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে গেঁছল, তখন তারা বলল, এ তো অলীক যাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট থেকে হিদায়তের কথা নিয়ে আগমন করেছে, এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে! (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন তারা (মু'জিযাসমূহ দেখে) বলল, এ তো এক যাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহ্‌র প্রতি) আরোপ করা হচ্ছে (যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মু'জিযা ও রিসালতের প্রমাণ)। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে এরূপ কথা কখনও শুনিনি। মূসা (আ) বললেন, (বিশুদ্ধ প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করতে না পারার পরও যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়াব এই যে,) আমার পালনকর্তা সম্যক অবগত আছেন যে, তাঁর কাছ থেকে কে সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কার পরিণতি এ জগত (দুনিয়া) থেকে শুভ হবে। নিশ্চয় জালিমরা (যারা হিদায়ত ও সত্য ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। [কেননা, তাদের পরিণাম শুভ হবে না। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে হিদায়তপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার পরিণাম ব্যর্থতা। সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ পাবে। এখন না মানলে তোমরা জান। মূসা (আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও শুনে] ফিরাউন (আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃন্দ নাকি মূসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবাইকে একত্রিত করে) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তার উযিরকে বলল, যদি এতে তাদের মনে শান্তি না আসে, তবে) হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, অতঃপর (এই পাকা ইট দ্বারা) আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। (আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য আছে---মূসার এই দাবিতে) আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছিল এবং তারা মনে করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঃপর (এই অহংকারের শাস্তিস্বরূপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মূসা (আ)-র এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) আমি তাদেরকে এমন নেতা করেছিলাম, যারা (মানুষকে) জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং (এ কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে) তাদের কোন সহায় থাকবে না। (তারা ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। সেমত) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَوْقِدْ لِىْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ—ফিরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উযির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফিরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্ব প্রথম ফিরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফিরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।---(কুরতুবী)

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র)-র সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত ঃ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

আয়াতে এবং مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ আয়াতে।

مقبوح—وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ শব্দের বহুবচন مقبوحين অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى
بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ
﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ
اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ اَنْ
تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ
اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ۭ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا
بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظَاهَرَا ۡ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ
كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ
اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ
اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়ত ও রহমত, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৪৪) মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ান-বাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত-স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৪৭) আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপন-কারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই যাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র হিদায়তের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়েছে। সে মতে) আমি মূসা (আ)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হল) পূর্ববর্তী উম্মতদের অর্থাৎ কওমে নূহ, আদ ও সামূদের) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর (যখন সে সময়কার পয়গম্বরগণের শিক্ষা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়তের মুখাপেক্ষী

হয়ে পড়েছিল) কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছি, যা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়ত ও রহমত ছিল, তাতে তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সত্যান্বেষীর প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অন্তর্জ্ঞান। এর পর সে বিধানাবলী কবূল করে। এটা হিদায়ত। এরপর হিদায়তের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও কবূল দান করা হয়। এটা রহমত। এমনিভাবে যখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পুনরায় হিদায়তের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী আপনাকে রসূল করেছি। এর প্রমাণাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা (আ)-র ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন উপায় জরুরী। এরূপ উপায় চারটিই হতে পারে। ১. বুদ্ধিগত বিষয়াদির মধ্যে বুদ্ধি। মূসা (আ)-র ঘটনা বুদ্ধিগত বিষয় নয়। ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের কাছ থেকে শ্রবণ। রসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা ও জ্ঞানচর্চা করেন নি। কাজেই এই উপায়ও অনুপস্থিত। ৩. প্রত্যক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা বলাই বাহুল্য। সেমতে এটা জানা কথা যে,) আপনি (তূর পর্বতের) পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসা (আ)-কে বিধানাবলী দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম)। তাদের মধ্যেও ছিলেন না, যারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভাব্যতা রহিত হয়ে গেল); কিন্তু (ব্যাপার এই যে,) আমি [মূসা (আ)-র পর] অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদায়তের মুখাপেক্ষী হয়। মাঝে মাঝে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন বটে; কিন্তু তাঁদের শিক্ষাও এমনিভাবে দুর্লভ হয়ে যায়। তাই আমি স্বীয় রহমতে আপনাকে ওহী ও রিসালাত দ্বারা ভূষিত করেছি। এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চতুর্থ উপায়। অন্যান্য উপায় দ্বারা ধারণাগত জ্ঞান অর্জিত হয়, যা এখানে আলোচ্য বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য। সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং চতুর্থটিই নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য। আপনি যেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেন নি, এর পরও বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মূসা (আ)-র মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি। সেমতে এটা জানা কথা যে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পর্কে) আমার আয়াতসমূহ (আপনার সমসাময়িক) লোকদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন; কিন্তু আমিই (আপনাকে) রসূল করেছি। (রসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তূর পর্বতের (পশ্চিম) পার্শ্বে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি [মূসা (আ)-কে] আওয়াজ দিয়েছিলাম (যে, يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ —এটা ছিল তাঁকে নবুয়ত দান করার সময়।)

কিন্তু (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে,) আপনি আপনার পালনকর্তার রহমতস্বরূপ নবী হয়েছেন, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ কোন পয়গম্বর দেখেনি, যদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, তওহীদ পরোক্ষভাবে তাদের কাছেও পৌঁছেছিল। সুতরাং وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا আয়াতের সাথে কোন বৈপরীত্য রইল না।) আর (তারা সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে যে, পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরই। তারা ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারে। নতুবা যেসব মন্দ বিষয় জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, সেগুলোর জন্য পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া সম্ভবপর ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত যে, হায়! রসূল আগমন করলে আমরা অধিক সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না; তাই রসূলও প্রেরণ করেছি, যাতে এই অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। নতুবা সম্ভাবনা ছিল যে,) আমি রসূল নাও পাঠাতাম, যদি এরূপ না হত যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (যা মন্দ হওয়া বোধগম্য) তাদের কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে) হলে (যার সম্পর্কে বুদ্ধি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কৃতকর্মের শাস্তি) তারা বলত, হে আমাদের পালন-কর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার বিধানসমূহের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পয়গম্বরের প্রতি) বিশ্বাসী হতাম। অতঃপর (এর দাবি ছিল এই যে, রসূলের আগমনকে তারা সুযোগ মনে করত এবং সত্য ধর্ম কবুল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই যে,) যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রসূল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, তখন (তাতে আপত্তি তোলার জন্য) তারা বলল, মূসা (আ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ কিতাব কেন দেওয়া হল না (অর্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় নাযিল হল না কেন? এরপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পূর্বে মূসা (আ)-কে যা (অর্থাৎ যে কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? [সেমতে জানা কথা যে, মুশরিকরা মূসা (আ) এবং তওরাতকেও মানত না। কারণ, তারা নবুয়তই মানত না।] তারা তো (কোরআন ও তওরাত উভয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই যাদু, পরস্পরে একাত্ম। (একথা বলার কারণ এই যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয় কিতাবই একমত।) তারা আরও বলে আমরা উভয়কে মানি না। (এটাই তাদের উক্তি হোক কিংবা তাদের উক্তির অপরিহার্য উদ্দেশ্য হোক এবং তারা একসাথে উভয়কে অস্বীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উক্তির সমাহার হোক— সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে মিল থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নয়; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও দুষ্টামি। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছেঃ হে মুহাম্মদ,) আপনি বলুন, তোমরা (এই দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তওরাত ও কোরআন ছাড়া)

কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্যের অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবাদিকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে এগুলোর অনুসরণ কর। কোরআনের সর্বাবস্থায় এবং তওরাতের তওহীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে সত্যরূপে প্রমাণ কর। একে أَهْدَى 'উত্তম পথ প্রদর্শক' বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়তের উপায় হওয়া। যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, তবে আমি তার অনুসরণ করব। মোটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ করলে আমি তার অনুসরণ করতে সম্মত আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা যদি আপনার (فَأْتُوا بِكِتَابٍ) কথায় সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না ; যেমন فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا আয়াতে বলা হয়েছে এবং এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে,) তবে জানবেন, (এসব সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ নয় ; বরং) তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় যে, যেভাবেই হোক অস্বীকারই করা উচিত। সুতরাং তারা তাই করেছে।) তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা (এমন) জালিম সম্প্রদায়কে (যারা সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পথভ্রষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র রীতি। ফলে, এরূপ ব্যক্তি সর্বদা পথভ্রষ্ট থাকে। এ পর্যন্ত তাদের لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ উক্তির পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জওয়াব ছিল। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোরআন একদফায় অবতীর্ণ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এই কালাম (অর্থাৎ কোরআন) তাদের কাছে সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা (বারবার নতুন শুনে) উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ আমি এক দফায় নাযিল করতেও সক্ষম ; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে অল্প অল্প নাযিল করি। এ কেমন কথা যে, তারা নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

لِلنَّاسِ—'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হূদ, সালেহ্ ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়-সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আ)-র পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيرَةٌ -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَائِرَ لِلنَّاسِ—এখানে نَاس শব্দ দ্বারা মূসা (আ)-র উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি نَاس শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানব-জাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত উমর ফারূক (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হিফাযতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন গ্রন্থ আল্লাহ্র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেইসব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেন নি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা

তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ---এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন পয়গম্বর আসেন নি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোন নবী আসেন নি। কিন্তু নবী-রসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ শব্দটি تَوْصِيل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরও সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়ত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতিঃ এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যাঁরা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

(৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[তওরাত ও ইনজীলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। জ্ঞানীগণ কর্তৃক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন দ্বারাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত প্রমাণিত হয়। সেমতে] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী) কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিশ্চয় এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য। আমরা তো এর (আগমনের) পূর্বেও (আমাদের কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে মানতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার পর নতুনভাবে অঙ্গীকার করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিল ; কিন্তু যখন আগমন করল, তখন অস্বীকার করে বসল। فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ---এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের সুসংবাদসমূহের প্রতীক রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ছিলেন ; যেমন সূরা আশ-শু'আরার শেষে বলা হয়েছে ঃ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ অতঃপর

আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তাদেরকে তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরেও এতে অটল রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা। অতঃপর তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ভাল (ও সহনশীলতা) দ্বারা মন্দ (ও কষ্ট প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্যত কষ্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) তারা যখন (কারও কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তা শোনে, (যা উক্তিগত কষ্ট) তখন একে (ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে) বলে, (আমরা জওয়াব দেই না) আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে, (ভাই) আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি। (আমাদেরকে ঝগড়া থেকে নিরাপদ রাখ।) আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ—এই আয়াতে সেই সব আহ্‌লে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা যখন সাহাবায়ে-কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে-কিরামের জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ থেকে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।---(মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খৃস্টান এবং তওরাত ও ইনজীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত।---(মাযহারী)

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য ব্যাপক? إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُهُ مُسْلِمِينَ ---অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবের এই আলিমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে ঃ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ—

---আল্লামা সুয়ূতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ উপাধি---এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও উমরের উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন। (هٰذا ما سنح لی واللہ اعلم)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ---অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবের মু'মিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্রা ভার্যাগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

---সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলেরও ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল।

এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দুইটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মু'মিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ও মহব্বত রসূল হিসাবও করেন এবং স্বামী হিসাবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নাই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কোরআনিক বিধি لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ —এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই সওয়ার দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বেশি। তাই

এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলিম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য بِمَا صَبَرُوا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ —অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুয়ায ইবনে জবলকে বলেন ঃ اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ গোনাহ্র পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে ঃ প্রথম, কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

অর্থাৎ মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর (জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ —অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার

সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই. সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়ত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত করেন। (অন্য কেউ হিদায়ত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়ত পাবে। বরং) যারা যারা হিদায়ত পাবে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হিদায়ত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। দুই. পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়ত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এই হিদায়তই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রিসালতের কর্তব্য পালন করবেন কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিদায়তের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হিদায়ত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাকে মু'মিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন। হিদায়তের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে, এই আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপে ইসলাম

গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মু'মিন-মুসলমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রাহুল মা'আনীতে আছে, আবূ তালিবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনোকষ্টের সম্ভাবনা আছে।

واللہ اعلم

وَقَالُوٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ
حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ
مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا
نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ
فِیْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِی الْقُرٰٓى اِلَّا وَ
اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
زِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

---

(৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘরবাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বেশ দূর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল। কাফিররা তাদের ঈমান আনার পথে যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আলোচ্য আয়াতসমূহে সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথী হয়ে (এই ধর্মের) হিদায়ত অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অচিরেই উৎখাত হব। (ফলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও হবে এবং জীবিকার ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজুহাতের অসারতা সুস্পষ্ট) আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হারমে স্থান দেই নি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় যা আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ আমার কুদরতেও জীবিকা দানস্বরূপ) আহারের জন্য পেয়ে থাকে? (সুতরাং সবার কাছে সম্মানিত হারম হওয়ার কারণে ক্ষতির কোন আশংকা নেই এবং এ কারণে রিযিক বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই অবস্থাকে তাদের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ঈমান আনা উচিত ছিল।) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য করে না।) এবং (স্বাচ্ছন্দ্যশীল জীবন নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাও নির্বুদ্ধিতা। কেননা,) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ নিয়ে মদমত্ত ছিল। অতএব (দেখে নাও) এগুলো এখন তাদের ঘরবাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস করেছে। (কোন পথিক ঘটনাক্রমে এদিকে এসে গেলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা তামাশা দেখার জন্য অল্পক্ষণ বসে যায় কিংবা রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়ীঘরের) আমিই মালিক রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হল না) আর তাদের আরেক সন্দেহ এই যে, কুফরের কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন যাবত কুফর করছি। আমাদেরকে ধ্বংস করা হয় নি কেন? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে----

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ الخ—এই কারণে তারা ঈমান আনে না। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত (জনপদসমূহের কেন্দ্রস্থলে কোন রসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং (পয়গম্বর প্রেরণ করার পরেও তৎক্ষণাৎ) আমি জনপদসমূহকে ধ্বংস করি না; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই জুলুম করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ না করে, তখন আমি ধ্বংস করে দেই। উপরে যেসব জনপদ ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে, তারাও এই আইন অনুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এই আইনদৃষ্টেই তোমাদের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই রসূল আগমনের পূর্বেও ধ্বংস করিনি এবং রসূল আগমনের পরেও এখন পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হোক, তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলে শাস্তি অবশ্যই হবে। সেমতে বদর ইত্যাদি

যুদ্ধে হয়েছে। ঈমান না আনার আরেক কারণ এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং পরকাল বাকী, তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা থেকে অন্তর মুক্ত হয় না যে, তাতে পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের পন্থা স্বরূপ ঈমানের চেষ্টা করা হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে শুনে রাখ) যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় (জীবন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এরও সমাপ্তি ঘটবে) আর যা (অর্থাৎ যে পুরস্কার ও সওয়াব) আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা বহুগুণে (এ থেকে অবস্থার দিক দিয়ে) উত্তম এবং (পরিমাণের দিক দিয়েও) বেশী (অর্থাৎ চিরকাল) স্থায়ী (অতএব তোমরা কি (এই পার্থক্যকে অথবা এই পার্থক্যের দাবিকে) বুঝ না? (মোটকথা, তোমাদের ওযর এবং কুফরকে আঁকড়িয়ে থাকা সবই ভিত্তিহীন ও অসার। কাজেই বুঝ এবং মান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا—অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ মক্কার কাফির তাদের ঈমান কবূল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।—(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ (٥٧)—

অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হিফাযতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হারমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হারমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবূল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হারমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিযিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হল না, উলটা ভয় হল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে।—(কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হারমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) এটা শান্তির

আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হারমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন ঃ মক্কা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثمرات শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার ঃ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَجَرٍ —— এর পরিবর্তে ثمرات كل شيء বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, ثمرات শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثمرات তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হারমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফিরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে ---এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই ঃ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ——এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার

প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশংকার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর!

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই ঃ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا—এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবূল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী—দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تَسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا—অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহ্‌র আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয় নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

أُمِّهَا رَسُولًا—حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। أُمِّهَا-এর সর্বনাম দ্বারা قُرَى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবূল করে না, তখন জনপদসমূহের ওপর আযাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট

শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে ; এ কারণেই কোন বড় শহরে রসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্‌র পয়গাম কবূল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার ওপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানূনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।---(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى—অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে---যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাস'আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে-মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝٦١ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ
فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝٦٢ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ
تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾
وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়ায দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ্বান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথপ্রাপ্ত হত! (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মু'মিন। তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে অপরাধীরূপে হাযির হবে। পার্থিব ভোগ-সম্ভারই কাফিরদের ভ্রান্তির কারণ, তাই তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা উভয় ব্যক্তির সমান না হওয়ার আসল কারণ এই যে, শেষোক্ত

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করবে। অতঃপর এই পার্থক্য ও গ্রেফতার করে হাযির করার বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই দিনটি স্মরণীয়,) যে দিন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (অর্থাৎ শয়তান। শয়তানদের অনুসরণে তারা শেরেকী করত। তাই তাদেরকে শরীক বলা হয়েছে। একথা শুনে শয়তানরা অর্থাৎ) যাদের জন্য (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কারণে) আল্লাহ্র (শাস্তি) বাণী (অর্থাৎ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (ওযর পেশ করে) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম (এটা জওয়াবের ভূমিকা। এই ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা যাদের সুপারিশ আশা করত, তারাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা পথভ্রষ্ট করেছি ঠিকই, কিন্তু) আমরা তাদেরকে এমনি (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি না করে) পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা (জোর জবরদস্তি ছাড়া) পথভ্রষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ আমরা যেমন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছি, কেউ আমাদেরকে এজন্য বাধ্য করে নি; তেমনিভাবে তাদের ওপর আমাদের কোন স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব ছিল না। আমাদের কাজ ছিল শুধু বিভ্রান্ত করা। এরপর তারা তাদের মত ও ইচ্ছায় তা কবুল করেছে; যেমন সূরা ইবরাহীমে আছে ঃ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي—উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অপরাধী বটে; কিন্তু তারাও নিরাপরাধ নয়।) আমরা আপনার সামনে তাদের (সম্পর্ক) থেকে মুক্ত হচ্ছি। তারা (প্রকৃতপক্ষে কেবল) আমাদেরই ইবাদত করত না (অর্থাৎ তারা যখন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তারা প্রবৃত্তিপূজারীও হল—শুধু শয়তানপূজারী নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যাদের উপর ভরসা করত, তারা কিয়ামতের দিন তাদের তরফ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। যখন শরীকরা এভাবে তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন মুশরিকদেরকে) বলা হবে, (এখন) তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। তারা (বিস্ময়াতিশয্যে অস্থির হয়ে) তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা জওয়াবও দেবে না এবং (তখন) তারা স্বচক্ষে আযাব দেখবে। হায়, তারা যদি দুনিয়াতে সৎপথে থাকত! (তবে এই বিপদ দেখত না।) সেদিন আল্লাহ্ কাফিরদের ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গাম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? সেদিন তাদের (মন) থেকে সব বিষয়বস্তু উধাও হয়ে যাবে এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে দুনিয়াতে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আশা করা যায় যে, পরকালে সে সফলকাম হবে (এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের ময়দানে কাফির ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যে সব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত

চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী; কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়তও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ
مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ
الْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ
اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ
بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ
فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত। সেমতে তিনি) যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (কাজেই সৃষ্টিগত ক্ষমতা তাঁরই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন (এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তাঁরই।) তাদের (আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই (যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে; যেমন মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে। এই বিশেষ ক্ষমতা থেকে প্রমাণিত হল যে,) আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে ঊর্ধ্বে। (কারণ, তিনি যখন এককভাবে স্রষ্টা ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একাই যোগ্য। কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান—উভয়েরই ক্ষমতা রাখে।) আপনার পালনকর্তা (এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তাঁর এককত্ব প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছে ঃ) তিনিই (পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত) আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তিনিই প্রশংসার যোগ্য। (কেননা উভয় জাহানে তাঁর কাজকর্ম তাঁর সর্বগুণে গুণান্বিত ও প্রশংসার যোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রাজ্য শাসনক্ষমতা এমন যে,) রাজত্বও (কিয়ামতে) তাঁরই হবে। (তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি ও পরিধি এত ব্যাপক যে,) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (বেঁচে যেতে পারবে না বা কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? (সুতরাং ক্ষমতায়ও তিনি একক।) তোমরা কি (তওহীদের এমন পরিষ্কার প্রমাণাদি) শ্রবণ কর না? (এই ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই) আপনি (এর বিপরীত দিক সম্পর্কে) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে। তোমরা কি (কুদরতের এই প্রমাণ) দেখ না? (কুদরত একক হওয়া দ্বারা বোঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি একক।) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও

দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম কর ও দিবা ভাগে রুযী অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা (এ উভয় নিয়ামতের কারণে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (অতএব অনুগ্রহেও তিনি একক। এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ—এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, يَخْتَارُ এর অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ্ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্র কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যিম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব—لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ—অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছা ঃ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের ওপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম-

সন্তানের ওপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণকে অন্য পয়গম্বরগণের ওপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের ওপর, ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানব জাতির ওপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর, মুহাম্মদ (সা)-কে সব বনী হাশিমের ওপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের ওপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোট কথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সংকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুইটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎ কর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর ওপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর, অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী ও অতঃপর আলী মূর্তযা (রা)-র ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-রও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর ওপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। "বো'দিত তাফসীল লি মাসআলাতিত তাফসীল" নামে বর্তমান লেখক এর উর্দু তর্জমা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে ও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ إلى قوله بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে

দিনের সাথে بِضِيَاءٍ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয় ; বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تَسْمَعُونَ এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দৃষ্টি-সীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(৭৪) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্র এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, (যাতে সবাই তাদের লাঞ্ছনা শুনে নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু বিষয়টিকে আরও জোরদার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দাঁড় করানো হবে এভাবে যে,) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ পয়গম্বরগণকে, তাঁরা তাদের কুফরের সাক্ষ্য দেবেন।) অতঃপর আমি (মুশরিকদেরকে) বলব, (এখন শিরকের দাবীর পক্ষে) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা (চাক্ষুষ) জানতে